নাফের দুপাড়ে দুঃস্বপ্নের ১২ মাস

আলতাফ পারভেজ

জীবনের ঝুঁকি নিয়ে নৌকায় করে নাফ নদী পাড়ি দিয়ে অনেক রোহিঙ্গা বাংলাদেশে এসেছেন। রয়টার্স ফাইল ছবি।

বিশ্ববাসী হয়তো ভুলেই গিয়েছে রোহিঙ্গা নিধনযজ্ঞের কথা। মিয়ানমার সরকারই সেটা মনে করিয়ে দিল এ সপ্তাহে মংডু ও বুথিডংয়ে নতুন করে সামরিক উপস্থিতি এবং কারফিউর মেয়াদ বাড়ানোর ঘোষণা দিয়ে। গত শুক্রবার মিয়ানমারের জনপ্রিয় প্রচারমাধ্যম 'ইরাবতী' সরেজমিন সূত্র উল্লেখ করে জানিয়েছে, মংডু ও বুথিডংয়ে স্থানীয় পুলিশ ও সেনাবাহিনী নতুন করে শক্তি বাড়াচ্ছে।

দক্ষিণ আরাকানের এককালের রোহিঙ্গাপ্রধান ওই দুই শহরে ১২ মাস ধরে রাত ১০টা থেকে ভোর ৬টা পর্যন্ত কারফিউ চলছে। রাজধানী নেপিডো থেকে জানানো হয়েছে, আরও দুই মাস চলবে এই অবস্থা। অর্থাৎ আগামী অক্টোবর পর্যন্ত রাতে কারফিউ থাকছে।

মিয়ানমার সরকারের এই ঘোষণা গত বছরের আগস্ট থেকে শুরু হওয়া রাখাইন নির্মমতার এক বছর পূর্তির কথাই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দিল বিশ্ববাসীকে। ইরাবতী সূত্রে দেখা যায়, আগুনে পুড়ে যাওয়া রোহিঙ্গা গ্রামগুলোর কোনো কোনোটি সৈনিকদের গ্যারিসনে রূপান্তর করে নিয়েছে মিয়ানমার সরকার। অর্থাৎ এক বছরের মধ্যে ওই সব জনপদে রোহিঙ্গাবসতির চিহ্ন চিরতরে মুছে দেওয়া হয়েছে। বাকি গ্রামগুলো বুলডোজার দিয়ে সমতল করে তারকাঁটা দিয়ে ঘিরে রাখা হয়েছে। গত বছর আগস্ট-সেপ্টেম্বরে এসব জায়গায় পরিচালিত মিয়ানমার সেনাবাহিনীর অভিযানকেই জাতিসংঘ মহাসচিব 'মানব ইতিহাসের জঘন্যতম এক দুঃস্বপ্ন' হিসেবে উল্লেখ করেছিলেন।

রহস্যময় 'আরসা'ও আর নেই

বিশ্ববাসী জানে, রাখাইন বা আরাকানে কারফিউ জারি হয়েছিল গত বছর ২৫ আগস্ট 'আরসা' নামের একটি সংগঠনের হামলার পরপর। মিয়ানমার পুলিশের কয়েকটি চৌকিতে আরসা বা আরকান রোহিঙ্গা স্যালভেশন আর্মির কথিত ওই হামলার পরপরই শুরু হয় রোহিঙ্গা উচ্ছেদ অভিযান। বিস্ময়কর হলো, যাদের 'সন্ত্রাসী হামলা'কে অজুহাত হিসেবে ব্যবহার করে আরাকানের রোহিঙ্গামুক্তকরণ শুরু, সেই আরসার কোনো অস্তিত্বই গত কয়েক মাসে প্রচারমাধ্যমে পাওয়া যাচ্ছে না।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম টুইটারে নজর দিয়ে দেখা গেল, গত জুলাইয়ের পর আরসা কোনো 'টুইট' করেনি। কৌতূহলোদ্দীপক দিক হলো, আরসার নামে টুইটার অ্যাকাউন্ট খোলা হয়েছে মার্চে। বহুল প্রচারিত 'সন্ত্রাসী' সংগঠন আরসার স্বল্প ব্যবধানে এরূপ আবির্ভাব ও নীরবতা এই প্রশ্ন তুলছে, আদৌ রোহিঙ্গাদের এ ধরনের কোনো সংগঠন ছিল কি না বা আছে কি না। আরসা সম্পর্কে মাঠপর্যায়ের বিশ্বাসযোগ্য কোনো সাক্ষ্য প্রমাণ না থাকায় অনেক নিরাপত্তা বিশ্লেষকই এ অনুমান করে থাকেন যে মূলত আরকান থেকে রোহিঙ্গাদের উচ্ছেদের লক্ষ্যে গত বছর আগস্টের হামলার ঘটনা ঘটানো হয়। আরসা ছিল আসলে একটা 'ফলস ফ্লাগ' বা নকল শত্রু।

রাখাইনে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে রোহিঙ্গাদের ঘরবাড়ি। রয়টার্স ফাইল ছবি।

তবে আরসার বাস্তব অস্তিত্ব না থাকলেও তার সঙ্গে ছদ্মযুদ্ধকে উপলক্ষ করে মিয়ানমার সরকার ইতিমধ্যে বাংলাদেশকে প্রায় আট লাখ রোহিঙ্গার ভরণপোষণের দায়িত্ব কাঁধে নিতে বাধ্য করেছে এবং ঘটনার এক বছর পর নতুন করে মিয়ানমারজুড়ে আরসাভীতি ছড়ানো হচ্ছে।

'ইসলামি জঙ্গিবাদ'-এর এই ভীতির মধ্য দিয়ে মিয়ানমার সরকার আন্তর্জাতিক সহানুভূতি পেতেও বিশেষ তৎপর। যে 'আন্তর্জাতিক সমাজ' মৌখিক সহানুভূতি এবং আর্থিক কিছু সহায়তা ছাড়া রোহিঙ্গাদের জন্য বাস্তবে ন্যায়বিচারধর্মী সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নিতে ব্যর্থ হয়েছে বলা যায়।

তদন্ত, বিচার, শরণার্থীদের ঘরে ফেরা- কিছুই হয়নি

রোহিঙ্গাদের বিষয়ে বিশ্বসমাজের গত এক বছরের সবচেয়ে বড় এবং প্রাথমিক ব্যর্থতা হলো আজও এই নিধনযজ্ঞের কোনো নিরপেক্ষ ও বিশ্বাসযোগ্য তদন্ত করা হয়নি। এমনকি মিয়ানমারকেও এই ঘটনার তদন্তে বাধ্য করা যায়নি। জাতিসংঘের তদন্ত উদ্যোগ বহু আগেই মিয়ানমার প্রত্যাখ্যান করেছে। গত মাসে কেবল দেশটি জানায়, ২০১৭ সালের আগস্ট-পরবর্তী মাসগুলোয় আরাকানে কী ঘটেছে, সেটার

তদন্তে তারা একটি নিরপেক্ষ তদন্ত কমিশন গঠন করেছে। চার সদস্যবিশিষ্ট এই কমিশনের প্রধান ফিলিপাইনের কূটনীতিবিদ রোসারিও মানালো গত সপ্তাহে জানিয়েছেন, আগামী এক বছরের মধ্যে তারা পুরো ঘটনার একটি তদন্ত প্রতিবেদন হাজির করতে পারবেন বলে আশা করছেন। তাঁর এই আশাবাদ যদি সত্য হয়, তাহলেও বলতে হয় যে আরাকানের গত বছরের নির্মম ঘটনাবলির পূর্ণাঙ্গ চিত্র পেতে বিশ্বকে আরও এক বছর অপেক্ষা করতে হবে। এ ধরনের তদন্তের ফলাফল বা ভবিষ্যত আবার নির্ভর করছে তদন্ত কমিশনের কাজে মিয়ানমারের সেনাবাহিনী কতটা সহযোগিতা করছে তার ওপর। মিয়ানমার সরকার চার সদস্য বিশিষ্ট এই কমিশনে দুজন সদস্য রাখছে নিজ দেশের। এই সদস্যরা নিজ দেশের মানবতাবিরোধী অপরাধের তদন্ত করতে কতটা সক্ষম হবেন, তা নিয়ে সন্দেহ থেকেই যায়।

রোহিঙ্গাদের বিরুদ্ধে সংগঠিত অপরাধের বিচারে হেগভিত্তিক আন্তর্জাতিক অপরাধ আদালতের (আইসিসি) উদ্যোগও সফল হয়নি। যেহেতু মিয়ানমার আইসিসির সদস্য নয়, তাই চেষ্টা ছিল বাংলাদেশের শক্ত ভূমিকার মধ্য দিয়ে সেই বিচার প্রক্রিয়া এগোবে। বাংলাদেশে নিজ দেশের কয়েক লাখ নাগরিককে জোর করে ঢুকিয়ে দিয়ে মিয়ানমার যে 'অপরাধ' করেছে, তা আইসিসিতে বিচারযোগ্য বলেই অভিমত দিয়েছিলেন আন্তর্জাতিক আইনে অভিজ্ঞরা। আইসিসির সদস্য হিসেবে এবং মিয়ানমারের পদ্ধতিগত সন্ত্রাসের দায়ভার বহনকারী হিসেবে বাংলাদেশের তরফ থেকে আরাকানের গত বছরের ঘটনাবলির বিচার দাবির যৌক্তিক অবস্থান ছিল। কিন্তু গত ১২ মাসজুড়ে বরাবরই মিয়ানমারের সঙ্গে দ্বিপক্ষীয়ভাবে 'সমস্যা'র সমাধানে সচেষ্ট থেকেছে বাংলাদেশ। ফলে মিয়ানমারের বিচার প্রশ্নে আইসিসির এখতিয়ার দুর্বল হয়েছে। বাংলাদেশের সঙ্গে 'সমঝোতা' বিষয় ব্যাপক প্রচার করে মিয়ানমার সহজেই আইসিসির বিচার প্রক্রিয়া অবজ্ঞা করতে পারছে। গত জুলাইয়ে নেপিডো সরকার ঘোষণা দিয়েই আইসিসির বিচার প্রক্রিয়া অগ্রাহ্য করেছে।

বাংলাদেশের পাশাপাশি ইউএনডিপিসহ জাতিসংঘের দুটি সংস্থার সঙ্গেও মিয়ানমার রোহিঙ্গাদের প্রত্যাবর্তন বিষয়ে সমঝোতার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়কে এই মর্মে ধোঁকা দিতে পেরেছে যে তারা রোহিঙ্গা সমস্যার সমাধানে ইচ্ছুক। বাস্তবে ওই সব সমঝোতা কাগুজে দলিলের অধিক কোনো ভূমিকা রাখতে পারেনি এখনো। কিন্তু তা ব্যবহার করে হাজার হাজার রোহিঙ্গাকে খুন ও ধর্ষণের দায় থেকে মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী ও তাদের সহযোগীরা রেহাই পেল। অথচ নির্ভরযোগ্য অনুসন্ধানী প্রতিবেদনগুলো ইতিমধ্যে দেখিয়েছে অভিযানের প্রথম মাসেই মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনী আরাকানে প্রায় ৬ হাজার ৭০০ রোহিঙ্গাকে হত্যা করেছিল, যাদের মধ্যে শিশুর সংখ্যা ছিল অন্তত ৭৩০।

আরাকানে রোহিঙ্গা নিধনাভিযানকে আইসিসির বিচার প্রক্রিয়ায় আনার দ্বিতীয় উপায় ছিল জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ কর্তৃক বিষয়টি সেখানে প্রেরণ। সেটাও সফল হয়নি নিরাপত্তা পরিষদে রাশিয়া ও চীনের উপস্থিতির কারণে। ঢাকার তিন বন্ধুরাষ্ট্র রাশিয়া-চীন-ভারত রোহিঙ্গা প্রশ্নে প্রথম থেকেই মিয়ানমারের পাশে থেকেছে এবং বাংলাদেশের কূটনীতিবিদেরা এ ক্ষেত্রে তাদের মনোভাবে সামান্যই পরিবর্তন ঘটাতে পেরেছে। ফল হিসেবে কোনো রোহিঙ্গাকেই আজও ফেরত পাঠানো যায়নি। নাফের ওপাড়ে প্রত্যাবর্তনের কোনো পরিবেশও তৈরি হয়নি।

পুড়িয়ে দেওয়া রোহিঙ্গা গ্রামের এই দৃশ্য স্যাটেলাইটে ধরা পড়েছে। রয়টার্স ফাইল ছবি।

ভবিষ্যৎ অনিশ্চিত

রাশিয়া-চীন-ভারতের বিপরীতে যুক্তরাষ্ট্র-ইউরোপীয় ইউনিয়ন-কানাডা রোহিঙ্গা বিষয়ে মিয়ানমারের বিরুদ্ধে কঠোর পদক্ষেপের পক্ষপাতি হলেও সামান্যই তাদের কাজে প্রতিফলিত হয়েছে। ঘটনার প্রায় ৩৬৫ দিন শেষে তারা মিয়ানমারের চারজন সামরিক কমান্ডার এবং আরাকান অভিযানে অংশ নেওয়া দুটি সেনা ইউনিটের বিরুদ্ধে অবরোধমূলক পদক্ষেপের কথা জানিয়েছে। কিন্তু এ ধরনের পদক্ষেপের বাস্তব মূল্য অতি নগণ্য এবং তা হাস্যকরও বটে। দেশটির সর্বোচ্চ পর্যায়ের সামরিক ও বেসামরিক নেতৃত্বের অনুমোদন ও সিদ্ধান্ত ছাড়া কয়েকজন সামরিক কর্মকর্তা ও সৈনিক হাজার হাজার মানুষকে হত্যা ও হাজার হাজার নারীকে পদ্ধতিগতভাবে ধর্ষণ করতে পেরেছে- এ বিশ্বাস করার কোনো অবকাশ নেই। বোঝা যাচ্ছে, যুক্তরাষ্ট্র আপাত আরও কঠোর পদক্ষেপ নিয়ে মিয়ানমারকে চীনের আরও নিকটে ঠেলে দিতে ইচ্ছুক নয়। অর্থাৎ কয়েক লাখ রোহিঙ্গা মুসলমানের ন্যায়বিচার নিশ্চিত করার চেয়েও মিয়ানমারের ভূরাজনৈতিক ও বাণিজ্যিক আকর্ষণ যুক্তরাষ্ট্র ও তার ইউরোপীয় বন্ধুদের এখনো মোহাবিষ্ট করে রেখেছে।

ক্যাম্পবাসী রোহিঙ্গারা অবশ্য ইতিমধ্যে আন্তর্জাতিক কূটনীতির অর্থহীন এসব বাগাড়ম্বরের মোহ কাটিয়ে উঠেছে বলেই মনে হয়। ক্লান্ত ও হতাশ এই শরণার্থীরা পুরোপুরি নিয়তির কাছে সমর্পিত এখন। বর্ষা মৌসুমের বিপন্নতা পেরিয়ে আসন্ন শীতের জন্য প্রস্তুতি নিচ্ছে তারা। জন্মভূমি ছেড়ে আসা আট লাখ মানুষের সঙ্গে প্রতিদিন প্রতিটি ক্যাম্পেই যোগ হচ্ছে আরও অনেক নতুন মুখ। যাদের কোনো রাষ্ট্রপরিচয় নেই এবং যাদের দায়িত্ব নেওয়ার কোনো দায়ও নেই বিশ্বের কারও। মুখোশের আড়ালে বিশ্বের অমানবিক চেহারাটি রোহিঙ্গাদের চেয়ে আর বেশি কে দেখেছে?

আলতাফ পারভেজ, গবেষক। প্রথম আলো, ২০ আগস্ট ২০১৮-এ প্রকাশিত।